অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধি — পণপ্রথা, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধি—পণপ্রথা, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা

পরিবার :- মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ, সামাজিক জীব। একাকীত্ব কোনদিনই মানুষের ধর্ম নয়। পরিবারভুক্ত হয়ে মানুষ সমাজে বাস করে। জীবন-যাপনের জন্যে মানুষ যে সব আচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে পরিবার ও বিবাহ অত্যন্ত প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। **"বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন না করিলে মনুষ্যজাতি সম্ভবত এতদিন বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিত না।"** [১] বাঁচার তাগিদেই মানুষ পরিবার গঠন করেছে। শিশু থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সন্তানদের লালন পালন করতে হয় বলে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরিবার সর্বাপেক্ষা ছোট সংস্থা হলেও এর ভূমিকা মানবজীবনে সর্বাধিক। পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে "Mac Iver and Page" তাঁদের "Society : An Introduction Analysis" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "The family is a group defined by a sex-relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children." [২] সুতরাং পরিবার গঠনের প্রাথমিক শর্ত হল যৌনবাসনার চরিতার্থতা, সন্তান-উৎপাদন ও পালন এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও এ ব্যাপারে বলেছেন, **"জীবপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত এবং বিবাহ জিনিসটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা।"** [৩] পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে "William. J. Goode বলেন, **"For these reasons, man must live in some sort of family grouping to be fed, protected, and taught what nature has not provided."**[৪] পরিবারের আয়তন যেমনই হোক না কেন, তার কেন্দ্রবিন্দু হল সন্তান। স্বামী ও স্ত্রী মিলে হয় দম্পতি, আর সন্তানকে নিয়ে হয় পরিবার। এ প্রসঙ্গে E.W. Burgess and Locke এক বর্ণনামূলক সংজ্ঞায় বলেছেন, পরিবার হল, **".....a group of persons united by ties of marriage, blood or adoption; Constituting a single household; inter-acting and communicating with each other in respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common culture."** [৫] সমাজজীবনের প্রথম ধাপই হল পরিবার। পারিবারিক ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের পরস্পরের সাথে বিবাহ যোগ্যতা স্থির করা হল পরিবারের প্রধান কাজ। নবজাত শিশুকে পরিচয় করানো পরিবারের দায়িত্ব। T. B. Bottomore বলেছেন, **"The family transmits values which are determined elsewhere; it is an agent, not a principal."** [৬] ক্রমবিবর্তনের ধারায় যে পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে তার ভূমিকা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা যৌন, অর্থনৈতিক, প্রজনন ও শিক্ষা সম্পর্কীয়—এই চারপ্রকার কাজের কথা বলেছেন।

এই পরিবার হল সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও প্রাচীন গোষ্ঠী। সমাজের ভিত্তি স্বরূপ পরিবারের প্রধান কাজ হল সন্তানকে সামাজিকীকরণ, যার উপরে সমাজ গড়ে ওঠে। প্রাচীন কালের পরিবার বর্তমানে গঠনের দিক থেকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর প্রধান কারণ শিল্প বিপ্লব। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আর্থ-সামাজিক সচলতা প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়াদি পরিবারের স্বয়ম্ভরতা বিনষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশ, ধর্মীয় গোঁড়ামির অবলুপ্তি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি পরিবারের পরিকাঠামো ও প্রকৃতির উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তবে একথা সত্যি যে তারাশঙ্করের প্রথম পর্বে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় পারিবারিক জীবনযাত্রা প্রাচীনতার দেওয়ালে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষার অভাব, জনস্বাস্থ্যের অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক মন্দা, সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে গ্রামের পরিবারে তখনও আধুনিকতার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা বা আত্মকেন্দ্রিক ও কৃত্রিম মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। কৃষি-নির্ভর পরিবার এর মূল কারণ। তাই যৌথ পরিবার-চিত্র ছিল প্রকট। ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ধরে। পরিবারে পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিবর্তে পুত্র-কন্যাদের প্রাধান্য বাড়ে। কেবল উপজাতির মধ্যে এই ধারা বিদ্যমান থাকে।

বিবাহ :- পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ল বিবাহ। বিবাহকে বাদ দিয়ে পরিবারের কল্পনা করা যায় না। বিবাহ হল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এক দৃঢ় বন্ধন। নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন মিলনের এক সামাজিক উপায় হ'ল বিবাহ। **"বিবাহ** বলতে বলা হয়েছে : **(a) .....ceremony or process by which the legal relationship of husband and wife is constituted; or (b) .....physical, legal and moral union between man and woman in complete community of life for the establishment of a family.** এ প্রসঙ্গে **Horton and Hunt** 'Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন—**Marriage is the approved social pattern whereby two or more**

persons establish a family." (৭) কিন্তু বিবাহ কেবলমাত্র যৌন আচরণকারী সামাজিক ব্যবস্থা নয়। এর মাধ্যমেই পরবর্তী পরিবারের বৈধ শিশুর জন্ম হয়। পিতার পরিচয়েই সন্তান সমাজে পরিচিত হয় এবং সেই সন্তানকে লালন-পালন ও পরিচর্যা করার দায়িত্বও তাদের উপরেই থাকে। পিতৃত্ব অজ্ঞাত থাকলে সন্তান সমাজে জারজ বলে ধিকৃত হয়। তাই বিবাহ শুধু যৌন সম্ভোগের ছাড়পত্র নয়, পিতৃত্বের স্বীকৃতিও বটে। এই জন্যে Malinowski বিবাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন, **"Marriage cannot be defined as the licensing of sexual intercourse but rather as the licensing of parenthood."** (৮) তাই "বেশীরভাগ দম্পতির জীবনে নর-নারী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট" (৯) হলেও জীবনের সাহচর্য সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর মিল থাকে। তাছাড়া সমাজে অবৈধ প্রণয় ও সন্তান বিধিবদ্ধ নয়, নানা সমস্যার জন্যেও বিবাহের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে আপস করে চলতে হয়। এই আপসের ফলশ্রুতিই হল বিবাহ।

বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত তাৎপর্য আছে বলেই প্রত্যেক সমাজে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়। এ বিষয়ে Anderson and Parker তাঁদের Society : its organisation and operation গ্রন্থে বলেছেন, **"The wedding is the recognition of the significance of marriage to societies and to individuals through the public ceremony usually accompanying it. Such a ceremony indicates the society control. The pageantry impresses upon the couple the importance of the commitment they are undertaking."** (১০)

ভারতবর্ষের জনজীবনে বিবাহ এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। হিন্দু পন্ডিতগণ বিবাহকে 'সংস্কার' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ধর্মশাস্ত্রে ত্রিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে বিবাহের প্রয়োজন। ধর্ম, প্রজা (সন্তান পালন), এবং রতি (যৌনসম্ভোগ)। দুই নরনারী ও দুই পরিবারের মিলন বিবাহের দ্বারা সংঘটিত হয়। গার্হস্থ্য জীবনই হল ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সমষ্টি জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব।" (১১)

আবার সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা প্রসঙ্গে মনু বলেছেন—

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনম্" (১২)

অর্থাৎ অপত্যের উৎপাদন ও তার প্রতিপালন, প্রতিদিন অতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি গৃহস্থের কর্তব্য কেবল স্ত্রীর সাহচর্যেই সম্ভব।

এই বিবাহ পদ্ধতি ভারতবর্ষের বহুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। অবশ্য বিবাহের প্রকার ভেদ ছিল অনেক। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী খগেন্দ্রনাথ সেন তাঁর "সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা"র ২য় খন্ডে আট (৮) প্রকারের বিবাহ উল্লেখ করেছেন। (১৩) এদের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রজাপত্য এই চারটি শ্রেষ্ঠ কারণ, এগুলি সমাজ অনুমোদিত। গান্ধর্ব, ও রাক্ষস এই দুটি বিবাহ ক্ষত্রিয়দের জন্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু আসুর এবং পৈশাচ এই দুপ্রকার বিবাহকে অবৈধ বলেছেন মনু। " ন কর্তব্যৌ কদাচন" (১৪) 'আসুর' বিবাহে কন্যাপণ দিতে হত। আর সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। অর্থাৎ কন্যাপণকে মনু নিন্দা করেছেন।

বৌদ্ধযুগেও নারীর সম অধিকার স্বীকৃত ছিল। ঋগবৈদিক যুগে পণপ্রথার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলে ১২৬তম সুক্তে কক্ষীবাণের সঙ্গে স্বনয়ের কন্যার বিবাহকালে কক্ষীবাণ একশত স্বর্ণমুদ্রা ও এক শত অশ্ব যৌতুক বা পণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের আধপত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে। হৃদয়হীন, স্বার্থপর, পক্ষপাতদুষ্ট, সমাজের লোভ ও লালসার ঘৃণ্য পৈশাচিক উল্লাসে নারীর প্রেম-প্রীতিময় স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়— অশিক্ষা, কুশিক্ষা, এবং নানা কুসংস্কারে বন্দিনী করে মূল্যহীন করে তোলে নারী জীবনকে। তাই নারী সমাজের ও সংসারের বোঝা স্বরূপ হয়ে পড়ে।

হিন্দুশাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহ দুপ্রকার। অনুলোম ও প্রতিলোম। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ হলে তা অনুলোম এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ হলে তা প্রতিলোম বলে। প্রতিলোম বিবাহ সমাজে অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু অনুলোম বিবাহ সমাজস্বীকৃত ছিল। এই ব্যবস্থা ইংল্যান্ডেও ভিক্টোরীয়যুগে দেখা যায়। A. L. Basham বলেছেন, **"This distinction is to be found in other societies. For instance, in victorian England the pear who married an actress rarely incurred the same scorn and ostracism as the lady who married her groom."** (১৫)

পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা শূদ্রাণী হলে তাদের সন্তান 'চণ্ডাল' বলে অভিহিত হতো। অনেকে বলেন যে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের ফলেই বর্ণসংকর জাতি বা উপজাতি বা উপবর্ণ , উপ-উপবর্ণ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই ভারতে জাতির এত বাহুল্য।

সেনবংশের রাজা বল্লালসেন খ্রীস্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। 'কুলীন' শব্দের অর্থ সৎকুলোৎপন্ন। 'আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান—এই ন'টি গুণের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য দান করেন বল্লাল সেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। " তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা আদিশূরের আমন্ত্রণে কনৌজ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করেন। প্রথমে তাঁহারা সংখ্যায় ৫ জন ছিলেন। বল্লাল সেন গুণগত ভিত্তিতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের চারটি ভাগে ভাগ করিলেন। যাঁহাদের উল্লিখিত নয়টি গুণই আছে, তাঁহারা হইলেন, "কুলীন", যাঁহাদের ৮টি গুণ-তাঁহারা হইলেন "সিদ্ধ শ্রোত্রীয়", যাঁহাদের ৭টি গুণ আছে তাঁহারা হইলেন, "সাধ্য শ্রোত্রীয়", এবং তাহার কম হইলে তাঁহারা হইলেন "কস্ত শ্রোত্রীয়"। শ্রোত্রীয় অর্থ যাঁহার শ্রুতিতে (বেদে) প্রতিষ্ঠা আছে। এই বিভাগের ফলে ১৯টি ব্রাহ্মণ (রাঢ়ী) কুলীনের মর্যাদা পাইলেন। নিয়ম হইল যে কুলীন, পুরুষ-কুলীন, সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় অথবা সাধ্য-শ্রোত্রীয় বিভাগ হইতে, এবং কস্ত শ্রোত্রিয় কেবলমাত্র নিজেদের মধ্য হইতে স্ত্রী সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অপর পক্ষে কুলীন কন্যারা কেবলমাত্র কুলীন পুরুষ এবং কস্ত-শ্রোত্রীয় কন্যা কস্ত-শ্রোত্রীয় পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন; সাধ্য-শ্রোত্রীয় কন্যারা সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় অথবা নিজেদের গোষ্ঠীর পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করিতে পারিতেন। সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় কন্যারা নিজেদের গোষ্ঠী হইতে, কুলীনশ্রেণী হইতে পতি সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ..... যে সকল কুলীনের সহিত নিম্নবর্ণের পাত্র-পাত্রীর বিবাহ হইত, তাহারা (কুলীন বংশীয়) শ্রেণীচ্যুত হইত তাহাদের পুত্র কন্যারা 'বংশজ' হইত। এইরূপে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হইল; কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রীয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথায় ভাগ হইল, যথা কুলীন, কাপ ও মৌলিক।" [১৬] সেনবংশের আমল থেকেই নারীজীবনে অন্ধকার নেমে আসে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ কন্যাদের। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মুজমদার বলেছেন, "একদিকে উপযুক্ত পাত্র মিলিত না সুতরাং কন্যাকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইত। অন্যদিকে পুরুষ একাধিক বিবাহ করিত। বহু কুমারীর বিবাহ হইত না। যাহাদের বিবাহ হইত তাহারা প্রায় সারাজীবন পিতৃগৃহেই থাকিত, স্বামীর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হইত। কারণ অনেক কুলীনের ৫০/৬০ বা তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিত। .....অনেক ব্রাহ্মণের পেশাই ছিল বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ..... এ রূপ অনেক ঘটনা শোনা যায় যে এক মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসী, ভাইঝি প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০/১২টি কন্যার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে— এবং ১০ হইতে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের সকল স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যে একসঙ্গে বিধবা হইয়াছে। কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা এত অধিক হইত যে একটি খাতাতে বিবাহিতা স্ত্রীগণের নাম পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন।" [১৭] এই কৌলিন্য প্রথা বহুবিবাহের অন্যতম কারণ। আবার বরপণের বৃদ্ধি ঘটাতেও কৌলিন্য প্রথার অবদান নেহাত কম নয়। দ্বাদশ শতক থেকেই বাংলাদেশে তুর্কীদের আগমনে অনেক হিন্দু আর্থিক কারণে তুর্কীদের দরবারে যাতায়াত শুরু করে। মঘ ও পর্তুগীজদের এদেশে আগমন ও নারীহরণ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও গোষ্ঠীগত সম্মান বৃদ্ধির জন্যে মুখ্য বন্দ্য, মজুমদার, সারখেল, শিকদার, সরকার প্রভৃতি পদবী গ্রহণ করায় সমাজে এক বিপুল বিস্তারী পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে কৌলিন্য প্রথা ও পণপ্রথা আরও প্রকট হয়। যার কুফল বিভিন্ন নাটক ও গল্পে তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি "কুলীন কুল সর্বস্ব" নাটক। এই নাটকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, ".....অদ্যোপ্রান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলিন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।" [১৮] পণপ্রথা ও কৌলিন্য প্রথার দোষ সমাজে তুলে ধরাই ছিল নাটকে রামনারায়ণের লক্ষ্য। "বাংলা নাটকের ইতিহাস" গ্রন্থে অজিত কুমার ঘোষ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন— "কুলীন কুলসর্বস্ব" কৌলিন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া দেখাইয়া ইহার নিন্দা করা হইয়াছে।" [১৯] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন " রামনারায়ণের দুটি নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং 'নবনাটক' (১৮৬০) যথাক্রমে কৌলিন্য প্রথাও বহুবিবাহের কুফল দেখাইবার জন্যই লেখা হয়েছিল।" [২০] কেবল কৌলিন্য প্রথার রক্ষার জন্যে চারটি কন্যার (সহোদরা) সঙ্গে এক প্রবীণ, কদাকার, অকাট মূর্খ, কানা ও বধিরের বিবাহ হয়েছে তাই দেখানো হয়েছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে।

বহু বিবাহ বা পণপ্রথা রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশী দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা কদর্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলে সূপকার বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণরা কন্যাপণ হিসাবে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দান করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অনেকে অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিয়াছে।" [২১]

কন্যাপণের বিষময় রূপ দেখা যায় "ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কনের মা কাঁদে, টাকার পুঁটলি বাঁধে (১৮৬৩), রাধাবিনোদ হালদারের "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" (১৮৮৬) পাওয়া যায়। আবার বরপণের চিত্র বহু নাটকে চিত্রিত হয়েছে। যেমন— গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'বলিদান', রসরাজ অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট" (১৮৮৪) ইত্যাদি বহু নাটক।

রামকৃষ্ণ রায়— এর "লোভেন্দ্র গবেন্দ্র প্রহসনে" (১৯২৭) পাত্রপাত্রীর পিতামাতার চিত্র বর্ণিত আছে। লোভেন্দ্র গান করে বলেছে—

"এক এক ছেলে দশ হাজারে
বেচবো কসে বে'র বাজারে,
মেয়ের বাবার দফা রফা
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো।" (২২)

কৌলিন্যের সাহায্যে অনেক সময় কুলীন ব্রাহ্মণ নিজেদের অনড় আর্থিক অবস্থাকে সচল করেছে। কুলীন পাত্রকে সামনে রেখে বহু অভিভাবক অর্থশোষণ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পিতৃ-মাতৃহীন হলে সংসারের দৈন্যতা ঘোচাতে তাঁর পিতৃব্য রাসবিহারীর ৮টি কুলীন কন্যার সাথে বিবাহ দেন। পরে রাসবিহারী নিজ ইচ্ছায় আরো ৬টি বিবাহ করেন। কৌলিন্য প্রথা কত ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা তদানীন্তন বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়— "পূর্ববঙ্গে বারজন কুলীন আছেন। তাঁহাদের সর্বসমেত ৬৫২ টি বিবাহ। তন্মধ্যে একজনের ৮০টি বাকি ১১জনের ৫৭২টি। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য তাঁহার কেবলমাত্র ৪০টি পত্নী। সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন চূড়ামনির বয়স ৭০বৎসর ও সর্বকনিষ্ঠের বয়স ৪০ বৎসর।" (২৩)

মধ্যযুগেও পণপ্রথা বিশেষ প্রভাববিস্তার করে। ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। উচ্চ-নীচ হিন্দুরা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে, সেইসঙ্গে বিদেশী আক্রমণে অর্থনৈতিক অবস্থা হিন্দুদের শোচনীয় হয়ে যায়। তাছাড়া অবিবাহিত মেয়েদের নিরাপত্তার অভাববোধ করতেন তাদের পিতা মাতা। তাই ভাল পাত্রের যোগারের জন্যে খোঁজা খুঁজি শুরু হয়। একদিকে ভালপাত্রের সংখ্যা যেমন কমে যায় অন্যদিকে বাল্য বিবাহ ও পণপ্রথার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। " এই সময়ই বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। সমাজে এমন একটি অবস্থা এসে দাঁড়ায়, যার যত বেশী সংখ্যক স্ত্রী থাকবে তার সামাজিক মর্যাদা ততবেশী হবে। তার ফলে তৎকালে সমাজে বিধবা, বালবিধবা, পণপ্রথা জনিত মৃত্যু ক্রমাগত বাড়তে থাকে।" (২৪)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ রদ করতে উদ্যোগী হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে বাংলাদেশে বহুবিবাহের তালিকা সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে হুগলী জেলায় অনুসন্ধান করে এক বিশদ তালিকা দিয়েছেন। সেখানে দেখা যায় ঃ—

	নাম ঃ	হুগলী জেলা/বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
১।	ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
২।	ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
৩।	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালী
৪।	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
৫।	দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৬	২০	ঐ (ক্রমশ) (২৫)

সুতরাং "তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে ৫০জন ব্যক্তি গড় পড়তায় ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই ১৪৬৮টি বিবাহ করিয়াছিলেন।" (২৬)

বাংলা নাটক বা প্রহসনে-ই প্রথম বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, অযোগ্য বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ, পণপ্রথা, বিবাহিতের ব্যাভিচার ইত্যাদির আলোকপাত ঘটে।

ব্রাহ্মণ সমাজে এবং উচ্চবর্ণের মধ্যেও কৌলিন্য প্রথার প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে বহু বিবাহ ঘটে। কুলীনেতর শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ অপেক্ষাকৃত কম ছিল কারণ কুলীন স্বামীদের ভার্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হত না। কিন্তু নীচবর্ণের স্বামীদের সে দায়িত্ব নিতে হত। কৌলিন্য প্রথার জন্যে সমাজে যেমন বহুবিবাহ ঘটেছে তেমনি ঘটেছে বাল্যবিবাহ। এই অসংখ্য বালাবধূ অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে পড়ে ফুলশয্যার স্বপ্ন সার্থক হবার আগেই হয়ত বিধবা হয়েছে, নয়ত বা অসংখ্য

সন্তান জন্ম দিয়ে অল্প বয়সেই অকর্মণ্য হয়ে অকালবার্ধক্যে প্রবেশ করেছে। সমাজে বিধবার সংখ্যাধিক্য কমাতে কৌলিন্যধারী নেতৃবৃন্দ সতীদাহের মত নরমেধ যজ্ঞের বিধান দিয়েছে। সতীদাহের কারণ প্রসঙ্গে "বিনয় ঘোষ" তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খন্ডে" বলেছেন, " বহু বিবাহের বিস্তারের **Corollary** বা প্রতিফলন হল বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। কুলীনের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই অর্থনৈতিক বোঝা, তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রনা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলল। তখন সহমরণের শৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায়মুক্তির অপকৌশলে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরণের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোন শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না।" [২৭] আবার অনেক সময় "বিধবার সম্পত্তির লোভে তার আত্মীয়স্বজন অনেক সময় জোর করে তাকে সতী করতো।" [২৮] বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকে সতীদাহের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ে। কলকাতা ডিভিশনে ১৮১৮/১৯ সালে সতীদাহে সংখ্যা ঃ—

জেলা		সংখ্যা				
বর্ধমান	-	৭৫		বর্ণ ও বয়স ভেদে সতীদাহ- ১৮১৯		
কটক	-	১৩	বয়স	ব্রাহ্মণ	বৈদ্য/কায়স্থ	নিম্নবর্ণ
খুড়দা	-	৯	১০ বছরের কম	২	x	x
পুরী	-	১১	১০-১৯ " "	৬	৫	৯
হুগলী	-	১১৫	২০-৩৯ " "	৩৪	২১	৫১
যশোহর	-	১৬	৪০-৫৯ " "	৫৯	৪৩	৮৮
জঙ্গলমহল	-	৩১	৬০ বছরের বেশী	৭৪	২৯	৮১
মেদিনীপুর	-	১৩				
নদীয়া	-	৪৭				
কলকাতা শহরতলী	-	৫২				
২৪ পরগণা	-	৩৯				
		৪২১				[২৯]।

এই জঘণ্যতম নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথা রামমোহনের চেষ্টায় বন্ধ হয় কিন্তু সমাজে বিধবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সদ্য গৌরীদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। অনেকের জীবনে আদিমপ্রবৃত্তি-জনিত কারণে পদস্খলন ঘটে; তাই হয়ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, " কলিতে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য পালনে অপারগ। সুতরাং একালে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত।" [৩০] তাই পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু কালের চাপে, রক্ষণশীল সমাজের কটাক্ষে, শিক্ষার অভাবে সর্বোপরি মানসিকতার অভাবে, বিধবা বিবাহ বহুল প্রচারের পরিবর্তে বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে বরপণ বর্তমানে সামান্য মাথাচড়া দিয়েছে, কিন্তু তারাশঙ্করের সময়ে কন্যাপণ ছিল। পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিয়ে বিয়ে করে। পণ দিতে অসমর্থ হলে কন্যাপক্ষের দাবী অনুযায়ী পাত্রকে শ্রম দিয়ে কন্যাপণ দিতে হত। আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য নিম্নবর্ণের মধ্যেও কন্যাপণ ছিল এবং এখনও কিছু আছে। এর কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক। উক্ত সম্প্রদায়ের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানতালে চাষাবাদ, কায়িক পরিশ্রম বা অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ। কন্যাকে বিয়ে দিয়ে কোন পরিবারের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই কন্যাপণের প্রচলন। যেমন সাঁওতালদের মধ্যে এই কন্যাপণ হিসেবে পাত্রীর দাদা ভাইকে একটি 'গরু' কন্যাপণ দিতে হয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে এই প্রথা এখনও আছে। আবার বিয়ের পর যদি পাত্র পাত্রীকে পছন্দ না করে বা স্বামী স্ত্রীর মিল না হয় তবে পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে সেক্ষেত্রে আর বিয়ে হয় না। হয় সাঙা বা নিকা। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। তারাও এক পতিকে ত্যাগ করে অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি মেয়েটি স্বামী পরিত্যাগ করতে চায়, তাহলে তার স্বামীকে গরুটি ফেরত দিতে হয়। যাযাবর বেদেদের মধ্যেও বিবাহ ও বিচ্ছেদ প্রায়ই ঘটত। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বহু বিবাহ বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে পণের বোঝা প্রায়ই ছিল না।

তারাশঙ্করের গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিধবা বিবাহ বা পণপ্রথা দু-চারটি গল্পে থাকলেও বহু বিবাহ অনেকগুলো গল্পে বিধৃত। আবার পণপ্রথা, কৌলিন্যপ্রথা বা বহুবিবাহ ব্রাহ্মণ পরিবারের দু-চারটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্বলিত গল্পগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। লেখকের বাল্যকালে কৌলিন্যের দোর্দন্ড প্রতাপ ছিল। কন্যার বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকতে হত। তারাশঙ্কর তাঁর "আমার কালের কথা"তে বলেছেন, "এক এক কুলীন তখনও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বিবাহ ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে এ রেওয়াজ তখন কমেছে। বিবাহ পেশা যাঁদের, তাঁদের অধিকাংশেরই বাস ছিল পূর্ববঙ্গে—যশোর, খুলনা, বিক্রমপুর। আমরাও কুলীন। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমান বিবাহ তখন নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সন্তান না হলে দু-তিন বিবাহরীতি অবশ্য তখনও বর্তমান। তখনকার দিনে সন্তানহীনা স্ত্রী বংশরক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিতেন, তার পিছনে ছিল সমাজের উৎসাহ। এমন স্ত্রী সমাজে অজস্র প্রশংসায় ধন্য হতেন। এসব অবশ্য সম্পত্তিশালী লোকের ঘরেই ঘটত।" (৩১)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনেকগুলোতে পণপ্রথা বহুবিবাহ ও কৌলিন্যের নিত্য যন্ত্রনার চিত্র রয়েছে। পণপ্রথার বলি "দেনাপাওনা", কৌলিন্যপ্রথা ও সহমরণের চিত্র "মহামায়া" ছাড়া বহুবিবাহ (একের বেশী) 'মধ্যবর্তিনী', 'দৃষ্টিদান', 'সুভা' 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি গল্পে মেলে। শরৎচন্দ্রের বহুবিবাহ-আশ্রিত গল্প "অনুরাধা" উল্লেখযোগ্য।

পণপ্রথা ঃ- পণপ্রথা নিয়ে তারাশঙ্করের প্রায় পাঁচটি গল্প রয়েছে। অবশ্য সরাসরি পণের বিষময় রূপ সব গল্পে নেই, কেবল পণের উল্লেখ আছে মাত্র। অর্থাৎ এই প্রথা গল্পে কোন প্রভাববিস্তার করে নি। যেমন "মুখুজ্জে মহাশয়" গল্পটির মূল ঘটনা অন্য। কিন্তু গল্পের সূত্রপাত পণ নিয়ে শুরু হয়েছে। ঘোষ পরিবারে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল তা জানা যায়। এখানে কন্যাপণ ও বাল্য বিবাহের সন্ধান মেলে। ছ'বছরের কন্যার বিয়ে হচ্ছে এবং কন্যাপণ দেড়'শ টাকা। সেই পণের দেড়শ টাকা ধার করতে এসেছে পাত্র শিবু ঘোষ জমিদারের কাছে।

ইতিহাস ঃ- এই গল্পটি মূলতঃ ইতিহাসাশ্রিত তবুও এর মধ্যে পণপ্রথার চিত্র স্পষ্ট। হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ষাট টাকা বেতনের শিক্ষক। সাহেব গুপ্তর কাছে কন্যার বিবাহের কথা বলতে গেলে সাহেবগুপ্ত হরপ্রসাদের কাছে সৌরীণের (অনাথ) জন্যে দু-হাজার টাকা দাবী করে। সেই টাকা হরপ্রসাদ দিতে পারে না ও বিয়েও হয় না। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় যে, বিপত্নীক বি, এ পাশ জমিদার হরপ্রসাদের মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করতে রাজী হয়েছে। প্রথম পক্ষের কোন সন্তান ছিল না। পাত্রের বয়স অবশ্য একটু বেশী হয়েছে— প্রায় ত্রিশ।

কালোমেয়ে ঃ- গল্পটিতে প্রত্যক্ষ পণের অঙ্কের উল্লেখ না থাকলেও, প্রভাব রয়েছে। উপীনবাবু স্কুল শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে তাঁর পা দুটো পঙ্গু— বড় দুর্ভাগ্য তাঁর। উপযুক্ত দুই ছেলে থেকেও নেই, উপরন্তু জঞ্জাল। বড় ছেলে বিমল এম, এ পাশ করে বিদেশে গিয়ে সেখানেই বান্ধবীকে বিয়ে করে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। মেজছেলে অমল প্রথম জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জেলে যায়। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে ও পরে অভিনয়ের জগতে গিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে। বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মাঝে মাঝে এসে টাকা, গয়না চুরি করে, কখনও জোর করেও নিয়ে যায়। কন্যা সুমতি-অত্যন্ত কালো, অথচ সুন্দরী। সুমতি দুধের দোকানে কাজ করে এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেছে। এগার বছর বয়স থেকে সুমতি সংসারের যাবতীয় কাজ করে। ছোটভাই শ্যামলকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে। মেয়ে বড় হয়েছে, ঘরে রাখা যায় না— অথচ সহায় সম্বলহীন উপীনবাবু। তাই তিনি বসত বাড়ীটুকু বিক্রির কথা বলেন। সেই কথা আড়াল থেকে সুমতি শুনতে পায়। পরে বাবাকে বলে, "আমার বিয়ে দেবেন না বাবা। না-না-বাবা, আমি কালো। না-।" এইভাবে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুমতি নিজে কালো বলে সমাজে অনেক ঘৃণা, অবজ্ঞা, হতাশা পেয়েছে, সেইসঙ্গে বাবা ও ভাইয়ের শেষ সম্বল ভিটেটুকু বিক্রি করে বিয়ে হোক তাও সে চায় নি। সে রাত্রির মত তপস্যা করতে চায় সূর্যের মত রূপবান পাত্রের জন্যে। অর্থাৎ সে চেয়েছে যদি তার জীবনে দাবীহীন উদারচেতা কোন পাত্র আসে তবেই সে বিয়ে করবে।

কৌলিন্যপ্রথা : কুলীনের মেয়ে ঃ- কৌলিন্য প্রথা নারীজীবনে এনেছিল এক ভয়াবহ বিভীষিকা। ধনদা মুখুজ্জের একমাত্র আদরের কন্যা তরু পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে দুখানি পত্র লিখে রেখে যায়। তার মধ্যে একখানিতে তরু নিজের জীবনের অন্তিম পরিণতির কথা লিখে যায়। ধনী ধনদা মুখুজ্জে কুলীন পাত্র পেয়ে কৌলিন্য বজায় রাখতে বহু পত্নীক (৫টি) বিপদতারণের সঙ্গে তরুর বিয়ে দেন। পেশাদার কুলীন কুলাঙ্গার পাত্র বিপদতারণ। উচ্ছৃঙ্খল, তস্কর, চরিত্রহীন বিপদতারণকে পাত্র নির্বাচনের সময় অনেকে ধনদাবাবুকে বাধা দেন। কিন্তু ধনদা একগুয়ে এবং অর্থের মোহে হিতাহিত জ্ঞান হারান। তিনি আশা করেছিলেন যে অর্থ দিয়ে, চাকরী দিয়ে, ঘরবাড়ি করে দিয়ে বিপদকে বাড়ীতে বেঁধে রাখবেন। তাই তিনি স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণবাবুর নিষেধের উত্তরে বলেছিলেন, "রূপোর শেকল দিয়ে বেটাকে বেঁধে রাখব। ঘর করে দেব, জমি দেব, আর সাবরেজেষ্টারর আপিসে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেব, বুঝলে।" এই আশায় বিয়ে দিলেও তরুর জীবনে অচিরেই অন্ধকার নেমে আসে— ফুলশয্যার দিনেই শরশয্যা রচিত হয়। মদ্যপ

বিপদতারণের কদর্য ব্যবহারে অসহায় তরু দিশাহারা হয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। কিন্তু কুলীনের মেয়ে, তাই নিস্তার নেই। বছর চারেক পর তরুর বয়স যখন সতের তখন তার বাবা জামাইকে বাড়ী এনেছে প্রতিরাতের জন্যে পাঁচ টাকা সম্মানী দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। প্রথম দিনেই এসে বিপদ সুযোগ বুঝে তরুর কানের মাকড়ী নিয়ে ভোর রাতে পালিয়ে যায়। ধনদা বাবুর মৃত্যুর পর বিপদতারণ তরুর সঙ্গে কিছুদিন থাকলেও একদিন তরুর যথাসর্বস্ব চুরি করে পালিয়ে যায়। যে টুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ছোট দাদারের অসুখে খরচ হয়ে যায়, ফলে তরু ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করে। সধবা কুলীন কন্যার মর্যাদা তথাপি খোয়া যায় নি। নির্লজ্জ, বিবেকহীন কদর্যস্বামী বিপদতারণ সামান্য কর্তব্যটুকুও করে নি। এমনকি তরুর নিজের ছোট দাদা স্বামীপরিত্যক্তা ছোট বোনটির সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়ে খেয়েছে। অসুখে ছোটদাদা মারা গেলে সংসারের সব দায়িত্ব তরুর কাঁধে এসেছে। পাড়ার যোগেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী এয়ো সংক্রান্তির ব্রত করেছেন, তাতে সধবা হিসেবে তরু আমন্ত্রণ চেয়ে নেয়। সে গাঙ্গুলীবাড়ীতে গিয়ে সোনার তাগা চুরি করে ধরা না পড়লেও তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত কথা এমনকি তাগাটি গাঙ্গুলীদেরই নর্দমায় যে ফেলা আছে সে কথাটাও লিখে যায়। কৌলিন্য প্রথা নিয়ে সার্থক গল্প এটি। তারাশঙ্করের পূর্বপুরুষ ছিলেন "উড়ে কুলীন" হয়তো লেখকের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও এই জঘন্য কৌলিন্য প্রথা বিদ্যমান ছিল। এই গল্পটি সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, " এ গল্পে শিল্পীর সহানুভূতি স্বয়ম্প্রকাশ। বাংলাসাহিত্যে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' থেকে কৌলিন্য প্রথাকে নিয়ে অনেক সার্থক রচনাই হয়েছে তারাশঙ্করের 'কুলীনের মেয়ে' গল্পটি বিশুদ্ধ ছোটগল্পের শিল্পসম্মত রূপে সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করেছে। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে স্রষ্টার লেখনী প্রচারধর্মী না হয়েও কতটা মর্মস্পর্শী হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গল্পটি।" (৩২) 'হোলি' গল্পে কানাই মুখুজ্জের স্বর্গীয় পিতা কুলীন বলে প্রায় ষাটটি বিয়ে করেছিলেন।

বহু বিবাহ ঃ- তারাশঙ্করের বহু বিবাহ বিষয়ক গল্পের সংখ্যা প্রায় দশটি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ তিনটি, বৈষ্ণব দুটি, ডোম দুটি, তাছাড়া সাঁওতাল, বেদে ও বাউরী পরিবারের একটি করে। বহু বিবাহ-বিষয়ক গল্পের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় যে তারাশঙ্করের লেখনীর যাত্রা শুরু ঊনবিংশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশক থেকে— যখন বাংলাদেশ অনেকখানি প্রগতির পথ অতিক্রম করেছে, দেশ ও জাতি স্বাধীনতার তরঙ্গে উদ্বেলিত। শত শত তরুণ দেশ সেবায় নিবেদিত প্রাণ, নারীরাও ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে শিখেছে; অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়েছে, বাল্যবিবাহ প্রায়ই গেছে প্রভৃতি কারণে বহু বিবাহ সমাজে অনেকাংশে লুপ্ত হতে বসে ছিল। সমাজে একগামিতা বা একজন পুরুষের সঙ্গে এক নারীর দাম্পত্য জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হোত। বহুগামিতা বা এক কালে নারী বা পুরুষের একাধিক জনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন তখন অনেকাংশে নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল। এক পুরুষ বহু পত্নী গ্রহণ করতে পারত বিশেষ করে হিন্দু সমাজের কুলীনগণ। কিন্তু ১৯৫৫ সালের "হিন্দু বিবাহ আইন" মোতাবেক তা বন্ধ হয়ে যায়। আদিম ও উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহু বিবাহের সন্ধান মেলে তবে তা খুবই কম। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা" এই নীতি বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে গেছে।

উল্কা ঃ- এই গল্পের কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিতি না হলেও মূল ঘটনাকে পরিণতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বিমলা চরিত্র। হরিচরণ ব্রাহ্মণ-এর বিধবা শ্যালিকার কন্যা বিমলা— অসহায়া নিঃস্ব। হরিচরণ নিঃসন্তান তাই বিমলাকে আশ্রয় দিয়েছিল। হরসুন্দরী পিতৃ-মাতৃহীন ভাসুরের পুত্র জ্যোতির সাথে বিমলার বিয়ে দিতে চাইলে জ্যোতি বাড়ী থেকে চলে যায়। হরসুন্দরী তখন বিমলাকে নিয়ে বিমলার দেশের বাড়ীতে গিয়ে বিষয় সম্পত্তিটুকু বিক্রি করে পাঁচশ টাকা পণ দিয়ে ঐ গ্রামেরই ষাট বছরের এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বৃদ্ধ রামেশ্বর বিপত্নীক, কিন্তু সংসারে চারপুত্র ও পুত্রবধূ বিদ্যমান। তথাপি বৃদ্ধের বিবেকে বাধেনি, ছয় মাসের মধ্যেই বিমলা বিধবা হয়েছে। সামাজিক অন্যায় ও ব্যক্তি স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বিমলার মত সহজ সরল মেয়েদের জীবন এভাবেই মরুভূমি হয়েছে।

কুলীনের মেয়ে ঃ- ধনীর একমাত্র কন্যা নয়নের মণি হওয়া সত্ত্বেও বিপথগামী স্বামীর হাতে পড়ে সেই কন্যা তরুর জীবন ছারখার হয়ে গেছে। লোভী ব্রাহ্মণ নিজে কৌলিন্যের দোহাই দিয়ে সবশুদ্ধ ছটি বিয়ে করেছে এবং রক্ষিতাও তার অনেক, অথচ নিজে বেকার ও অর্থহীন। তরুর সমস্ত অর্থ, গয়না, তস্করের মত আত্মস্যাৎ করেছে, বিনিময়ে সামান্য কর্তব্যও পালন করে নি। সমাজে তার কোন অন্যায় বা শাস্তির দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। লেখকের যুগেও মেয়েদের এইভাবে অপমান ও পুরুষের শত অন্যায়ের পরেও সাধুবেশে থাকা যেত।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ- বিভা সেন এই গল্পের নায়িকা। তার মা ধনীর গৃহে রক্ষিতা ছিল। বিভা ভালোবেসে পার্থ মুখার্জীকে বিয়ে করে। পরে অভিনয়ের জগতে গিয়ে এবং স্বামীর শয়তানিতে সে সুরেণকে গ্রহণ করে পরে আবার ভবেশকে গ্রহণ করে। এমনি করে অনেক পুরুষ এসেছে তার জীবনে। শেষে এক দিন সে এক সন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করে ফাঁসিতে যায়। এখানে বিভার বহুভর্তৃক জীবনের লক্ষণ স্পষ্ট।

মালাচন্দন ঃ- গল্পটি বৈষ্ণব পরিবারের ঘটনা। এরা ভিক্ষে করে কিন্তু সংসার বাঁধে। গায়ে নামাবলী, কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে (স্বামী-স্ত্রী), বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী একত্রে একতারা খঞ্জনী নিয়ে গানগেয়ে ভিক্ষে করে, আবার গৃহস্থের মত আচার ব্যবহার মেনে চলে। মোহনদাস বাবাজী ঘরে জীর্ণা স্ত্রী থাকতেও সে কথা গোপন করে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বিধবা তুলসীকে। সতীনের সঙ্গে থাকে তুলসী এবং স্বামীসেবা করে চলে অকৃত্রিমভাবে। একদিন বৃন্দাবন যাত্রার কথা বলে তুলসী। মোহনদাস যেন অন্য কিছু ভাবে। তুলসীর প্রতি মোহনের আকর্ষণ যেন আগের মত আর নেই। হঠাৎ কয়েকদিনের জন্যে মোহনদাস গ্রামান্তরে যায়, ফিরে আসে নতুন সেবাদাসী নিয়ে। তুলসী বরণ করে নতুন সঙ্গীনকে ঘরে তোলে, সন্ধ্যায় নিজের হাতে ফুলশয্যা সাজিয়ে দেয়। পরদিন সকালে তুলসী মহান্তর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। মোহনদাসের বহুপত্নীক আসক্তি গল্পের ট্রাজেডি সৃষ্টি করেছে। তুলসী সৎ ও জাতবোষ্টমের মত পারিবারিক জীবন যাপন করতে চেয়েছিল, তাই বিধবা হওয়ার পর সে আর নতুন মালা গাঁথে নি। কিন্তু শঠ, মিথ্যাবাদী কামুক মোহনদাসের ভালোমানুষের মত অভিনয়ে সে সব ভুলে গিয়েছিল।

মহামারী ঃ- এই গল্পটির পটভূমি এক গ্রাম— যেখানে হঠাৎ কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এই রোগের সূত্রপাত বিবাহের বরযাত্রীদের মধ্যে একজনের প্রথম হয়। যে বিবাহটি সংঘটিত হয়েছে তাতে বর তৃতীয় পক্ষ বিয়ে করতে এসেছে। প্রথম দুই স্ত্রী মারা গেছে। মারা যাওয়ার কোন কারণের উল্লেখ নেই। বিনাপণে সুন্দরী দরিদ্রকন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করতে এসেছে রামায়ণ পালাগানের অধিকারী মশাই। কিন্তু দলের একজনের কলেরায় মৃত্যু হলে অধিকারী মশাই পালিয়ে যায়। বহুদিন পরেও সে গ্রামে নববধূকে নিতে আসে না। এখানেও কারণের উল্লেখ নেই। হয়তো কুসংস্কার এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

মতিলাল ঃ- এই গল্পটি ডোম পরিবারভুক্ত। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই বহুপত্নীক ও বহুভর্তৃক। এই পর্যায়ের আর একটি গল্প 'প্রহ্লাদের কালী'। প্রহ্লাদ ভন্না (জাতিতে ডোম) ডাকাত ও কালী ভক্ত। সে জীবনে সাতটি মেয়ের সর্বনাশ করেছে। প্রথম বিবাহ দশ বছর বয়সে করেছিল— তখন পাত্রীর বয়স ছিল তিন। এরপর আরও দুটি বিবাহ করেছিল। বাকী বিবাহ না করলেও সেই মেয়েদের সাথে প্রহ্লাদ কিছুদিন খেলা করেছিল। ছেলেপুলে ও স্ত্রীদের কোন খবর ও দায়িত্ব সে পালন করেনি।

সাপুড়ের গল্প ঃ- গল্পটির নায়িকা কালী বেদেনী। সে বহুভর্তৃক, তিনবার বিয়ে করেছে এবং পরিত্যাগ করেছে নির্দ্বিধায়। স্বৈরাচারিণীর মত ঘুরে বেড়ায় ঝাঁপিতে এক পুরুষ সর্প নিয়ে। এখন ওটাই তার বঁধু। শেষে, এক সন্ন্যাসীর প্রেমে পড়েছে। চার পাঁচ মাস তার সঙ্গে থাকার পর হঠাৎ সন্ন্যাসী যেদিন কালীকে বন্ধ্যা হবার জন্যে ওষুধ খাওয়ার কথা বলে সেদিন কালী সন্ন্যাসীকে সহ্য করতে পারেনি— নেশাগ্রস্ত সন্ন্যাসীকে কামড়ে দিয়ে ক্ষতস্থানে সাপের তীব্র বিষ ঢেলে মেরে ফেলে।

একটি প্রেমের গল্প ঃ- অশিক্ষিত আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারে আজও বহু বিবাহ ঘটে চলেছে। লেখকের সমকালীন যুগে রাঢ় বাংলা বিশেষ করে বীরভূম জেলায় অসংখ্য সাঁওতালের বসতি। তাদের বহু বিবাহ প্রকট। এই গল্পটিতে বুধন সাঁওতাল কত সহজে বহু বিবাহ করেছে এবং নিরপরাধা স্ত্রীকে অনায়াসে ভুলেছে— তাদের প্রেম, ভালবাসার এতটুকু মর্যাদা দেয় নি।

এক পশলা বৃষ্টি ঃ- গল্পের নায়িকা জয়া বাউরী— সুন্দরী, চঞ্চলা, বহুভর্তৃক, চরিত্রহীনা স্রষ্টা চরিত্রের রমনী হয়েও প্রেম, প্রীতি ও কর্তব্যের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং উনমানবী হয়েও দৈবীসত্তায় উন্নীত হয়েছে। ভরা যৌবনে চন্দ্র চৌধুরীর বাহু বন্ধনে সে ধরা দেয়। ধনী কন্ট্রাক্টর চন্দ্র তাকে বিয়ে করতে চাইলেও জয়া সে প্রলোভন জয় করেছে এবং কথা দিয়েছে যে চন্দ্রকে বিয়ে না করলেও সে চন্দ্রেরই সঙ্গিনী হিসেবে থাকবে। জয়া জোর করে চন্দ্রের বিয়ে দেয়। পরে ব্যবসায় লোকসান ও চন্দ্র দারিদ্রের যন্ত্রনায় রোগে জীর্ণ হয়ে স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে মারা যায়। জয়া তখন নিজের সমস্ত অর্থ ও গয়না খরচ করে সংসারটাকে বাঁচায়, অনাহারে, অর্ধাহারে থাকে, তথাপি ধনী ব্যবসায়ী সেজো দে বাবুর আহ্বানে সাড়া দেয় নি। এইভাবে অজস্র প্রলোভনকে জয় করে সে প্রেমিকের কথার মর্যাদা রেখেছে।

বিধবা বিবাহ

তারাশঙ্করের গল্পের মধ্যে বিধবা বিবাহের চিত্র প্রায় নেই বললেই চলে। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা নিয়ে কোন গল্পই নেই। এর কারণ বিংশ শতকে সামন্তপ্রথার অবক্ষয়, ব্রাহ্মণদের অতীত দাপটের অবসান, গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বনাশা অধঃপতন, উচ্চবিত্তদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহ প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ, নারীশিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের নিম্নে সেইসব অন্ত্যজ সংস্কার হীন, বন্ধনহীন আদিম সমাজে তখনও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। এইসব শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই কর্মঠ ও আদিম ক্ষুধায় জরাজীর্ণ। বিধবা মেয়েরা মাঠে বা

কারখানায় কাজ করে। সুতরাং জীবিকার প্রয়োজনে পুনর্বিবাহের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি অল্প বয়সের বিধবা সমাজে নিরাপত্তার অভাব বোধ করত এবং শ্বশুরবাড়িতে যথাযথ সম্মান পেত না। অনেক সময় নেশা করার সময়েও অন্য পুরুষে আসক্ত হত ও সাঙা (বিবাহ) করত। আদিবাসী সম্প্রদায়ে মেয়েরাও পুরুষের সাথে সমানতালে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত, আবার বাড়ীতেও খেত। নেশার ঘোরে মেঠোয়ালী সুর তুলে পরপুরুষের ঘরে চলে যেত। বস্তুতঃ বর্তমানে বিধবা বিবাহ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কমে এসেছে। যদি অল্প বয়সে বিধবা হয় তাহলে পুনর্বিবাহের প্রশ্ন জোরদার হয়। বিধবা সম্বন্ধীয় প্রায় তিনটি গল্পের সন্ধান মেলে তারাশঙ্করের—

স্থলপদ্ম ঃ- নায়িকা বেলে বিধবা; দেখতে সুশ্রী; কলেরায় তার বাবা, ভাইয়ের মৃত্যু হয়। সংসারে সে একা। রাজমিস্ত্রী গণির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি বেলে সন্তান কামনায় পাগলিনী হয়ে যায়। মাতৃত্বের জন্যে সে হারা বাউরীকে সাঙা করে। হারা সংসার চালানোর কথা ভাবে, অথচ বেলে ভাবে ভাবী সন্তানের কথা— এই নিয়ে দুজনের বিচ্ছেদ। হারা যখন নিরুদ্দিষ্ট হয় তখন বেলে গর্ভবতী। কিন্তু সন্তান লাভ করতে সে পারে নি। অসতর্ক মুহূর্তে পড়ে গিয়ে বেলের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

মালাচন্দন ঃ- বৈষ্ণব প্রধান গল্প। গার্হস্থ্য জীবনের আচার আচরণ পালন করে আবার 'রাধেকৃষ্ণ' বলে ভিক্ষা করে। বৈষ্ণবও বৈষ্ণবী দুজনেই থাকে। তুলসীর দশবছর বয়সে বিবাহ হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়সে সে বিধবা হয়। জয়দেবের মেলায় যাবার পথে মোহন দাস মহন্তের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং কিছুদিন পর মোহনদাসকে মালাচন্দন (বিবাহ) করে সুখ ও শান্তির জন্যে, কিন্তু চরিত্রহীন ও বহুপত্নীক মোহন দাসের সংসারে গিয়ে সে শান্তি পায় নি। দুঃখে ও ঘৃণায় তুলসী আবার স্বামীর ঘর ছেড়েছে।

প্রত্যাবর্তন ঃ- জেলেদের মধ্যে যে বিধবা-বিবাহ হয় তার প্রমাণ এই গল্পটি। নায়ক পশুপতি বিমাতার ও পিতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে বাল্য বয়সে ঘর ছাড়ে; দীর্ঘদিন পরে জাহাজে খালাসী গিরি করে কিছু টাকা কড়ি ও সাহেবী পোষাক পরে গ্রামে ফিরে আসে। সেই উপলক্ষে পাড়ায় সন্ধ্যায় এক মদের আড্ডা হয়। সেখানে পশুপতি সাহেবী কায়দায় নাচতে থাকে। সেই সময় রমার সাথে পরিচয় হয় এবং রমার রূপে পাগল হয়ে বিয়ে করতে চায় পশুপতি, কিন্তু বাবা ও মা মত দেয় না, কারণ রমার পরপর তিনবার বিবাহ হয়েছে। সব স্বামীই তার মারা যায়। তাই পাড়ার সকলের চোখে রমা 'বেউলো রাঁড়ী'। রমার প্রথম বিবাহ তিনবছরে, বিধবা পাঁচ বছরে, দ্বিতীয়বার সাঙা হয় এক বৎসর পর অর্থাৎ ছয় বছরে কিন্তু ছ মাসের মধ্যেই বিধবা হয়, তৃতীয় বার বিবাহ হয়েছিল তের-চোদ্দ বছরে, মাসখানেকের মধ্যে সেই স্বামীও জলে কুমীরের পেটে প্রাণহারায়। তারপর পশুপতির সাথে বিয়ের ঠিক হলেও অবশ্য সে বিয়ে হয় নি।

পাদটীকা

১।	পরিমলভূষণ কর	:	সমাজতত্ত্ব	পৃ. ২৮৫
২।	R. M. Maclver and C. H. Page	:	Society	P-238
৩।	রবীন্দ্র রচনাবলী	:	জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড	পৃ. ৫
৪।	William J. Goode	:	The Family	P-13
৫।	Burgess and Socke : The Family : From Institution to Companionship			P-8
৬।	T. B. Bottomore	:	Sociology	P-175
৭।	অনাদিকুমার মহাপাত্র	:	বিষয় সমাজতত্ত্ব	পৃ. ৪২১
৮।	Quoted by Davis	:	Human Society	P-401
৯।	অতুলচন্দ্র গুপ্ত	:	সমাজ ও বিবাহ	পৃ. ৪৭
১০।	Anderson and Parker	:	Society : its organisation and operation	P-150
১১।	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা	:	জন্মশতবার্ষিক সং- ষষ্ঠ খন্ড	পৃ. ২৩৮
১২।	মনু সংহিতা ৯/২৭			
১৩।	খগেন্দ্রনাথ সেন	:	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (২য় খন্ড)	পৃ. ১০০
১৪।	মনুসংহিতা	:	৩, ২৪, ২৫১	

১৫।	A. L. Basham	:	The wonder That was India (Cal-1967)	P-148
১৬।	খগেন্দ্র নাথ সেন	:	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (২য় খন্ড)	পৃ. ১০৯
১৭।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১১০
১৮।	রামনারায়ণ তর্করত্ন	:	কুলীনকুল সর্বস্ব ভূমিকা	পৃ. ৫
১৯।	অজিতকুমার ঘোষ	:	বাংলা নাটকের ইতিহাস	পৃ. ৬৭
২০।	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	পৃ. ৪৪৬
২১।	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন	পৃ. ২৩৮
২২।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ২৪৭
২৩।	অনুসন্ধান, ২৯শে মাঘ, ১২৯৫			
২৪।	জয়ন্ত সরকার	:	পণের আর এক নাম অপমান	পৃ. ১৩
২৫।	বিদ্যাসাগর রচনাবলী	:	পাত্রজ সংস্করণ	পৃ. ৩৪৬
২৬।	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন	পৃ. ৬৫
২৭।	বিনয় ঘোষ	:	বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ (১ম)	পৃ. ১০০
২৮।	ডঃ অজয়েন্দ্রনাথ সরকার	:	ঊনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা	পৃ. ৫২
২৯।	বিনয় ঘোষ	:	বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১ম প্র:)	পৃ. ২৪২
৩০।	সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত	:	শম্ভুচন্দ্রের "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত", নতুন সং	পৃ. ১০৭
৩১।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	রচনাবলী, ১০ম খন্ড	পৃ. ৩৫৯
৩২।	জগদীশ ভট্টাচার্য	:	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) ভূমিকা	পৃ. ৫১

* * * * * * * * * * * *